ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃ খাত

[বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ধ্বস নামে। এসময় বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশী সংকুচিত হয়। তবে ২০১০ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্য ঘুঁরে দাঁড়ায়। বিশ্বমন্দার শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রভাব না পড়লেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক থেকে রপ্তানি ও আমদানি খাতে কিছুটা প্রভাব পড়ে যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বমন্দার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জন এবং সে প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক উদ্যোগ ও প্রণোদনা প্যাকেজের মত নানাবিধ সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মন্দার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১০.৩১ শতাংশ ও ৪.১১ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্যের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির নিরিখে এ প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। এ সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে তা ৩,৭৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। মন্দাত্তোর বিশ্ব বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশেরও বৈদেশিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৪০.৩১ শতাংশ ও ৪০.৫৯ শতাংশ। তবে বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসেবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত হ্রাস পাচ্ছে এবং মুদ্রার বিনিময় হারে কিছুটা অবচিতি ঘটেছে। তবে এ পরিস্থিতি সাময়িক এবং বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি এবং রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ, নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।]

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, April 2011 অনুযায়ী ২০০৮ সালে বিশ্ব বাণিজ্য ১৫.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২২.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১২.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০১০ সালে বিশ্ব বাণিজ্য পুনরুদ্ধার শুরু হয় এবং এ বছর বিশ্ব বাণিজ্য ২১.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। Outlook-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১১ ও ২০১২ সালে বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৭.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রবৃদ্ধি: ১৮.১৮ শতাংশ) ও ১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রবৃদ্ধি: ৭.৩৬ শতাংশ)। মন্দাকালীন সময়ে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণও (volume) ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং এ হ্রাসের হার বিশ্ব জিডিপি প্রবৃদ্ধির হ্রাসের হারের তুলনায় অনেক বেশী। আইএমএফ এর Outlook, April 2011 অনুযায়ী ২০০৯ সালে মোট বিশ্ব বাণিজ্যের (পণ্য ও সেবা) পরিমাণ হ্রাস পায় ১০.৯ শতাংশ (সারণি ৬.১) । এ সময়ে উন্নত অর্থনীতির আমদানি ও রপ্তানি হ্রাস পায় যথাক্রমে ১২.৬ শতাংশ ও ১২.২ শতাংশ। পক্ষান্তরে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ। ২০১০ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২.৪ শতাংশ, যার মধ্যে উন্নত অর্থনীতির আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১১.২ শতাংশ ও ১২.০ শতাংশ। অন্যদিকে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৩.৫ শতাংশ ও ১৪.৫ শতাংশ। আইএমএফ এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১১ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৭.৪ শতাংশ যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১২ সালে দাঁড়াবে ৬.৯ শতাংশে।

সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের (World trade volumn) প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা পরিবর্তন)

			প্রক্ষেপন	
	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
বিশ্ব বাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	-১০.৯	১২.৪	৭.৪	৬.৯
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	-১২.৬	১১.২	৫.৮	৫.৫
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	-৮.৩	১৩.৫	১০.২	৯.৪
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	-১২.২	১২.০	৬.৮	৫.৯
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	-৭.৫	১৪.৫	৮.৮	৮.৭

উৎস: World Economic Outlook, April 2011, IMF

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১১ সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৮৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩,৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে পণ্য রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪০.৪২ শতাংশ ও ৪১.৯২ শতাংশ, তবে আমদানি ও রপ্তানিতে প্রায় কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি হলেও আমদানি ভিত্তি বড় হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৫৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লিখিত সময়ে চলতি হস্তান্তর প্রবাহ ১.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সেবা, বাণিজ্য ও আয় হিসাব খাতে ঘাটতি যথাক্রমে ৪২.৯২ শতাংশ, ৪৬.৪৬ শতাংশ ও ১৬.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত উলেণ্টখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। আলোচ্য সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২৩৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছিল। নিম্নের সারণিতে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময় পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.২ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ সা (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-২৮৮৯**	**-৩৪৫৮**	**-৫৩৩০**	**-৪৭১০**	**-৫১৫২**	**-৪৮৫৫**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১০৪১২	১২০৫৩	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৬	১৪১১১
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-১৩৩০১	-১৫৫১১	-১৯৪৮১	-২০২৯১	-২১৩৮৮	-১৮৯৬৬
সেবা	-১০২৩	-১২৫৫	-১৫২৫	-১৬১৬	-১২৪০	-১৫৫৮
গ্রহণ	১৩৪০	১৪৮৪	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭১	১৭০২
প্রদান	-২৩৬৩	-২৭৩৯	-৩৪১৬	-৩৪৪৮	-৩৭১১	-৩২৬০
আয়	-৭০২	-৯০৫	-৯৯৪	-১৪৮৪	-১৪৮৪	-৮৫৪
গ্রহণ	১৩৬	২৪৪	২১৭	৯৫	৫২	৭২
প্রদান	-৮৩৮	-১১৪৯	-১২১১	-১৫৭৯	-১৫৩৬	-৯২৬
তন্মধ্যে, সরকারের সুদ পরিশোধ	-২০৪	-২১২	-২৩৪	-২৩৮	-২১৫	-১৫৫
চলতি হস্তান্তর	৫৪৩৮	৬৫৫৪	৮৫২৯	১০২২৬	১১৬১৩	৭৮৬৯
সরকারি	১২৫	৯৭	১২৭	৭২	১২৫	৭১
বেসরকারি	৫৩১৩	৬৪৫৭	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৮৮	৭৭৯৮
তন্মধ্যে ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৪৮০২	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭	৭৫০৮
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**৮২৪**	**৯৩৬**	**৬৮০**	**২৪১৬**	**৩৭৩৭**	**৬০২**
মূলধনী হিসাব	৩৭৫	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৪৮৮	২১১
মূলধনী হস্তান্তর	৩৭৫	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৪৮৮	২১১
আর্থিক হিসাব	-১৪১	৭৬২	-৪৫৭	-৮২৫	-৬৩৮	-১২৪৩
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)[১/]	৭৪৩	৭৯৩	৭৪৮	৯৬১	৯১৩	৫০৮
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৩২	১০৬	৪৭	-১৫৯	-১১৭	-৩৫
অন্যান্য বিনিয়োগ	-৯১৬	-১৩৭	-১২৫২	-১৬২৭	-১৪৩৪	-১৭১৬
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি)	১০২৩	১০৩৭	১৩৩৮	১২০৪	১৬০৪	৬৭৮
এমএলটি এমোর্টাইজেশন পেমেন্ট	-৪৮৮	-৫২৫	-৫৮০	-৬৪১	-৬৮৭	-৪৭২
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	-৩৭	-২৪	-৬	-৭০	-১৫৬	-১০৩
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	-২৫৬	৪৯৩	-১৬০	-১৬৯	৬৭	১২৬
অন্যান্য পরিসম্পদ	-৪৯৫	-৫৩৫	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২	-৫৪৬
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৮৯৮	-৪৮১	-১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৫	-১২০৯
বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৩৫	-১০২	-১৩৩	-২৪	-৩১৫	-১৯০
পরিসম্পদ	৩১	-৮৬	-১৪৬	-১২৯	-৪১০	-৪৫৩
দায়	২০৪	-১৬	১৩	১০৫	৯৫	২৬৩
ভুল ভ্রান্তি	-৭২০	-৬৯৫	-৪৬৮	১৬	-৭২২	-৬০
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৩৩৮**	**১৪৯৩**	**৩৩১**	**২০৫৮**	**২৮৬৫**	**-৪৯০**
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	-৩৩৮	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	৪৯০
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৩৩৮	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	৪৯০
পরিসম্পদ	-৫৫৪	-১৫৯৩	-৭৯৯	-১৮৮৩	-৩৬১৬	৬৮
দায়	২১৬	১০০	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১	৪২২

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। ১/ এন্টারপ্রাইজ সার্ভের ভিত্তিতে। সা=সাময়িক।

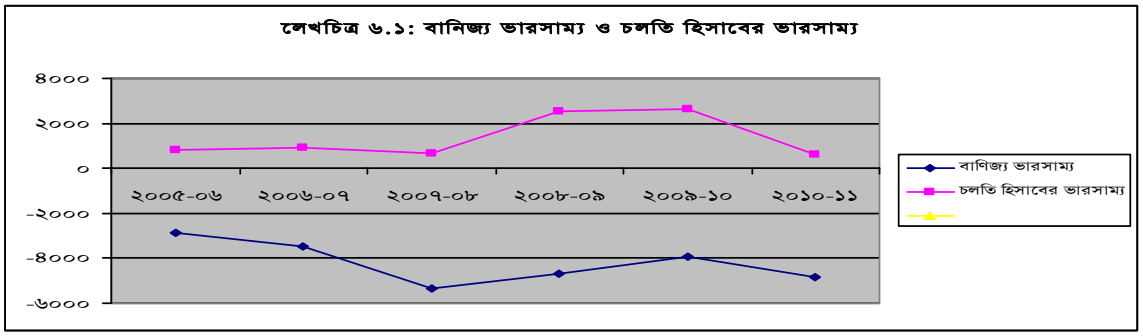

রপ্তানির সামগ্রিক ও পণ্যভিত্তিক গতিধারা

মন্দা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতও তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। ফলে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ ২০১১) মোট রপ্তানি আয় ২০০৯-১০ অর্থবছরের একই সময়ের ১১,৫৫০.৫৩ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৪০.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,২০৭.০৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য সময়ে নীটওয়্যার, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, চামড়া, পাদুকা, কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য ইত্যাদি খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়.। রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে যেসব খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায় তা হলোঃ কাঁচাপাট (৭১.২৬ শতাংশ), হিমায়িত খাদ্য (৫৭.৪৩ শতাংশ), পাদুকা (৫০.১৭ শতাংশ), নীটওয়্যার (৪৪.৩৬ শতাংশ), তৈরি পোশাক (৩৭.৭৬শতাংশ), চামড়া (৩৭.১৬ শতাংশ), পাটজাতপণ্য (৩৭.০৯ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (২৩.২৬ শতাংশ), সিরামিক টেবিলওয়্যার (১৯.৮৭ শতাংশ), কৃষিজাত পণ্য (১৫.৭৫ শতাংশ) ও অন্যান্য খাত (৫৮.৫৮ শতাংশ)। অপরদিকে, চা (৫৬.০৮ শতাংশ), রাসায়নিক দ্রব্য (১৩.২৩ শতাংশ), পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৮.০৫ শতাংশ), প্রকৌশল সামগ্রী (১.৮০ শতাংশ) ইত্যাদি খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। সারণি ৬. ৩ এ রপ্তানি আয়, রপ্তানি আয়ের অংশও রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৩ ঃ রপ্তানি আয়, রপ্তানি আয়ের অংশ ও রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি

পণ্যসমহ	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানির অংশ			প্রবৃদ্ধি		
	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (জুলাই-মার্চ)	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (জুলাই-মার্চ)	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (জুলাই-মার্চ)
১। কাঁচাপাট	১৪৮.১৭	১৯৬.২৭	২৬৭.৮৯	০.৯৫	১.২১	১.৬৫	১২.১৭	৩২.৪৬	৭১.২৬
২। চা	১২.২৯	৫.৬৫	২.৩১	০.০৮	০.০৩	০.০১	-১৭.৪৬	-৫৪.০৩	-৫৬.০৮
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪৫৪.৫১	৪৩৭.৪০	৪৭০.৫৩	২.৯২	২.৭০	২.৯০	-১৪.৮৯	-৩.৭৬	৫৭.৪৩
৪। কৃষিজাত পণ্য	২৬৭.৪১	২৪২.৩৫	২৪১.২৭	০.৭৯	১.৫০	১.৪৯	১.৮	-৯.৩৭	১৫.৭৫
৫। পাটজাত পণ্য	২৬৯.২৫	৫৪০.১৭	৫৬৯.৩১	১.৭৩	৩.৩৩	৩.৫১	-১৫.৪২	১০০.৬২	৩৭.০৯
৬। চামড়া	১৭৭.৩২	২৩০.৫২	২১০.২৭	১.১৪	১.৪২	১.৩০	-৩৭.৬৫	৩০.০০	৩৭.১৬
৭।পেট্রোলিয়াম উপজাত	১৪২.০৩	৩০১.১৫	১৯৫.৫৬	০.৯১	১.৮৬	১.২১	-২৩.২৭	১১২.০৩	-৮.০৫
৮। তৈরি পোশাক	৫৯১৮.৫১	৬০১৩.৪৩	৫৯৬১.৮২	৩৮.০২	৩৭.১১	৩৬.৭৯	১৪.৫৪	১.৬০	৩৭.৭৬
৯। নীটওয়্যার	৬৪২৯.২৬	৬৪৮৩.২৯	৬৬০৫.৪৮	৪১.৩১	৪০.০১	৪০.৭৬	১৬.২১	০.৮৪	৪৪.৩৬
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	২৩৭.১১	১০২.৮৭	৬৭.৯৭	১.৮০	০.৬৩	০.৪২	২৯.৫৫	-৫৬.৬২	-১৩.২৩
১১। পাদুকা	১৮৬.৯৩	২০৪.০৯	২২১.৮৭	১.২০	১.২৬	১.৩৭	১০.২২	৯.১৮	৫০.১৭
১২। হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	৬.৪৪	৩.৭৯	৩.১৮	০.০৪	০.০২	০.০২	১৭.৩০	-৪১.১৫	২৩.২৬
১৩। প্রকৌশল সামগ্রী	১৮১.৩৪	৩১১.০৯	২২১.৬১	১.২২	১.৯২	১.৩৭	-১৩.৭৫	৭১.৫৫	-১.৮০
১৪।সিরামিক টেবিলওয়্যার	৩১.৭০	৩০.৭৮	২৮.৪২	০.২০	০.১৯	০.১৮	-১৭.৩০	-২.৯০	১৯.৮৭
১৫। অন্যান্য	১১০২.৯২	১১০১.৮০	১১৩৯.৫৮	৭.৬৯	৬.৮০	৭.০৩	৭.৯০	-০.১০	৫৮.৫৮
মোট রপ্তানি	১৫,৫৬৫.১৯	১৬২০৪.৬৫	১৬,২০৭.০৭	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০.৩১	৪.১১	৪০.৩১

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

দেশভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ ২০১১) বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের মধ্যে ৩,৭৭৬.৩ মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যা দেশের মোট রপ্তানি

আয়ের ২৩.৩ শতাংশ । যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যগুলোর মধ্যে ছিলঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ ও হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি (১৪.৩৭ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৮.৯১ শতাংশ), ফ্রান্স (৬.২৭ শতাংশ) প্রভৃতি দেশ। সারণি ৬.৪ এ দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৪ ঃ দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৭৮৯.৮৮	৫৯৮.১৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০১.৬৯	৬৪৬৭.০০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৮১.৪৪	৬৪৭.৯৬	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.০৮	৫৯৮৬.০০
২০০২-০৩	২১৫৫.০০	৮২০.৭২	৭৭৮.২৫	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭০.৮১	৬৫৪৮.০০
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	১২৯৮.৫৪	৮৯৮.২১	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৯০	৭৬০৩.০০
২০০৪-০৫	২৪১২.০৫	১৩৫৩.৮০	৯৪৩.১৭	৬২৬.১৭	৩২৫.৪৩	৩৬৯.১৮	২৯১.৯৪	৩৩৫.২৫	১২২.৪১	১৮৭৫.১২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	৩০৩০.২০	১৭৬৪.১১	১০৪৮.৬২	৬৭৭.৫০	৩৫৯.২০	৪২৫.৭৫	৩২৭.৪০	৪০৬.১৫	১৩৭.৭৮	২৩৪৯.৪৫	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০২	১৯৫৫.৩৮	১১৭৩.৯৫	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	৪৫৭.২১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৫৬	২১৭৪.৮১	১৩৭৪.০৩	৯৫৩.১৩	৪৮৮.৩৯	৫৭৯.২৩	৬৫৩.৮৮	৫৩২.৯০	১৭২.৫৬	৩৫৯১.৩১	১৪১১০.৮০
২০০৮-২০০৯	৪০৫২.০০	২২৬৯.৭০	১৫০১.২০	১০৩১.০৫	৪০৯.৮০	৬১৫.৫১	৯৭০.৮০	৬৬৩.২০	২০২.৬০	৩৮৪৯.৩৩	১৫৫৬৫.১৯
২০০৯-১০	৩৯৫০.৪৭	২১৮৭.৩৫	১৫০৮.৫৪	১০২৫.৮৮	৩৯০.৫৪	৬২৩.৯২	১০১৬.৮৮	৬৬৬.৮৩	৩৩০.৫৬	৪৫০৩.৬৮	১৬২০৪.৬৫
২০১০-১১*	৩৭৭৬.৩০	২৩২৯.৬৩	১৪৪৪.২৮	১০১৫.৫১	৪৩৭.৯৫	৬০৬.২০	৯৩১.৮৩	৬৯৪.৭৪	৩০১.১৫	৪৬৬৯.৪৮	১৬২০৭.০৭

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * জুলাই-মার্চ ২০১০-১১।

সারণি ৬.৫ এ গত এক দশকের বাংলাদেশের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা এবং রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান দেয়া হলো:

সারণি ৬.৫ ঃ ২০০০-০১ হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা এবং রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রপ্তানি	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন(%)
২০০০-০১	৬,৩১৪	৬,৪৬৭.৩০	১০২.৪৩
২০০১-০২	৫,৯৫০	৫,৯৮৬.০৯	১০০.৬১
২০০২-০৩	৬,৪০৫	৬,৫৪৮.৪৪	১০২.২৪
২০০৩-০৪	৭,৪৩৯	৭,৬০২.৯৯	১০২.২০
২০০৪-০৫	৮,৫৬৬	৮,৬৫৪.৫২	১০১.০৩
২০০৫-০৬	১০,১৫৯	১০,৫২৬.১৬	১০৩.৬১
২০০৬-০৭	১২,৫০০	১২,১৭৭.৮৬	৯৭.৪২
২০০৭-০৮	১৪,৫০০	১৪,১১০.৮০	৯৭.৩২
২০০৮-০৯	১৬,২৯৮	১৫,৫৬৫.১০	৯৫.৫০
২০০৯-১০	১৭,৬০০	১৬,২০৪.৬৫	৯২.০৭
২০১০-১১*	১৩,৩৭০	১৬,২০৭.০৭	১২১.২২

সত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * জুলাই-মার্চ ২০১০-১১

উপর্যুক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, বিশ্ব মন্দার প্রভাব সত্ত্বেও গত দুটি অর্থবছরে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি ছিল। চলতি (২০১০-১১) অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি আয় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। সারণি ৬.৬ -এ সার্কভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির গতিধারা দেয়া হলো:

সারণি ৬.৬ঃ সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (জুলাই-মার্চ)
আফগানিস্তান	২.৯২	৬.০৭	০.৫১	০.৮৮	০.৭৬	২.৭৭	৩.৬৮	২.৭৪	২.২১
ভুটান	১.৫৫	৩.৯৯	৩.৩৫	১.৬৫	১.৪০	১.৩৫	০.৬১	২.২৪	১.৮৪
ভারত	৯৯.৩৬	১০১.১৬	১৮৬.৯৫	২৭৯.১৪	২৮৯.৪১	৩৫৮.০৮	২৭৬.৫৮	৩০৪.৬৩	৩৫৯.৮২
মালদ্বীপ	-	-	০.৪৮	০.২৬	০.২৭	০.০৮	০.১৪	০.৭৪	০.৭২
নেপাল	০.৩০	১.২৭	০.৪৭	০.৮৩	০.৮৫	৬.৭১	৮.০৬	৮.৭৯	৬.৫৫
পাকিস্তান	৩৮.২২	৩৪.৭৮	৮৪.১৪	৫০.২৬	৬১.০৬	৭১.০১	৭৬.২২	৭৭.৬৭	৬৭.০৪
শ্রীলংকা	৭.০৬	১০.১৫	১২.১৬	১৪.৩৯	১৪.৮২	১৯.৩২	১৮.৬৭	২৩.৭৪	২২.২৭
মোট	১৪৯.৪১	১৫৭.৪২	২৮৮.০৬	৩৪৭.৪১	৩৬৮.৫৭	৪৫৯.৩২	৩৮৩.৯৬	৪২০.৫৫	৪৬০.৪৫

সত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

উপর্যুক্ত সারণি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সার্কভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ সর্বোচ্চ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এর পরিমাণ সার্কভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির ৭৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, সার্কভুক্ত দেশসমূহে ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ একই সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ৩ শতাংশ।

আমদানি পরিস্থিতি

২০১০-১১ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ৪১.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ব বাজারে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, মধ্যপ্রাচ্যে ও উত্তর অফ্রিকায় অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধির কারণে আলোচ্য সময়ে উলেণ্টখযোগ্য হারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এসময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। আলোচ্য সময়ে আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চাল (২,৩৬১.১১ শতাংশ), মূলধনী যন্ত্রপাতি (২৮৮.৩৬ শতাংশ), তুলা (১৪৩.২৭ শতাংশ), সুতা (৮৬.৭৭ শতাংশ), সার (৫৬.৯৪ শতাংশ), অপরিশোধিত পেট্রেলিয়াম (৪৭.৩০ শতাংশ), ক্লিংকার (৪৩.১৭ শতাংশ), পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য (৩৮.৮৬ শতাংশ) ইত্যাদি খাত মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। নিম্নের সারণি ৬.৭ এ পণ্য-ভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি দেখানো হলো:

সারণি ৬.৭ ঃ পণ্য-ভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
ক) প্রধান প্রাথমিক পণ্য	১৬৭৬	১৮৫৪	২০৬৯	৩৪৫৫	২৯১৬	২৯৪০	৩৫৮৪
চাল	২৬২	১১৭	১৮০	৮৭৪	২৩৯	৭৫	৪৪৩
গম	৩১২	৩০১	৪০১	৫৩৭	৬৪৩	৭৬১	৫৯৭
তৈলবীজ	৮৬	৯০	১০৬	১৩৬	১৫৯	১৩০	৬৫
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩৫০	৬০৪	৫২৪	৬৯৫	৫৮৪	৫৩৫	৫৪৫
তুলা	৬৬৬	৭৪২	৮৫৮	১২১৩	১২৯১	১৪৩৯	১৯৩৪
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্য	২৬৬২	৩০০২	৩৫৬৮	৪৮৪৪	৫০৩৫	৪৯৫৭	৪৫২৬
ভোজ্য তৈল	৪৪০	৪৭৩	৫৮৩	১০০৬	৮৬৫	১০৫০	৬৯৯
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	১২৫২	১৪০০	১৭০৯	২০৫৮	১৯৯৭	২০২১	১৬৫১
সার	৩৩২	৩৪২	৩৫৭	৬৩২	৯৫৫	৭১৭	৯৭৩
ক্লিংকার	১৭০	২১০	২৪০	৩৪৭	৩১৪	৩৩৩	২৬২
স্টেপল ফাইবার	৭৫	৭৬	৯৭	১১০	১১২	১১৮	১০৮
সূতা	৩৯৩	৫০১	৫৮২	৬৯১	৭৯২	৭১৮	৮৩৩
গ) মূলধনী যন্ত্রপাতি	১২১১	১৪৫৮	১৯২৯	১৬৬৪	১৪২০	১৫৯৫	৪০৭০
ঘ) অন্যান্য পণ্য(ইপিজেডসহ)	৭৫৯৮	৮৪৩২	৯৫৯১	১১৬৬৬	১৩১৩৬	১৪২৪৬	৮৮৫৮
সর্বমোট (সিআইএফ)	১৩১৪৭	১৪৭৪৬	১৭১৫৭	২১৬২৯	২২৫০৭	২৩৭৩৮	২১০৩৮
শতকরা পরিবর্তন**	২০.৬	১২.২	১৬.৪	২৬.১	৪.১	৫.৫	৪১.৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১১, ** শতকরা পরিবর্তন পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়

দেশওয়ারি আমদানি ব্যয়

দেশওয়ারি আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন এর অবস্থান শীর্ষে। এ সময়ে দেশের মোট আমদানির শতকরা ১৮.৪৯ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৪.৩৪ শতাংশ), মালয়েশিয়া (৪.৭৬ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৪.০১ শতাংশ)। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১১) দেশের আমদানি বাবদ মোট ২১,০৩৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ আমদানি ব্যয় এর পরিমাণ ছিল ১৪,৮৩৭ মিলিয়ন ডলার। নিম্নের সারণিতে দেশওয়ারী আমদানি ব্যয় এর একটি চিত্র দেখানো হলো:

সারণি ৬.৮ ঃ দেশওয়ারী আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	চীন	ভারত	সিংগাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দঃ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	৭০৯	১১৮৪	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০১-০২	৮৭৮	১০১৯	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	৯৩৮	১৩৫৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১১৯৮	১৬০২	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫	১৬৪২	২০৩০	৮৮৮	৫৫৯	৫৬৫	৪৩৯	৪২৬	৩২৯	২৭৬	৫৯৯৩	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	২০৭৯	১৮৬৮	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩০২	৭০৬৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২৫৭১	২২৬৮	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩১৩৭	৩৩৯৩	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	৩৪৫২	২৮৬৪	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০৩১	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১০৪৬	৭৮৮	৫৪২	৮৩৯	৪৬৯	১২৩২	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১*	৩৮৯০	৩০১৬	৮৪৪	৭৭৮	৫৬৯	৩৭২	৬৫৩	৩৭৪	১০০১	৯৫৪১	২১০৩৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *জুলাই ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি

বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি রপ্তানি আয় কিছুটা হ্রাস পেলেও প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের কারণে মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় থাকে। এছাড়া, সরকারের প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও বিচক্ষণ মুদ্রানীতির হাতিয়ারগুলোর (রিপো, রিভার্স রিপো ইত্যাদি) কার্যকর ব্যবহারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে বিনিময় হারে খুব সামান্যই উঠা-নামা পরিলক্ষিত হয়। চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং টাকার বিনিময় হারে কিছুটা অবচিতি পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের গড় ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল প্রতি ডলার ৬৯.১৮ টাকা যা চলতি অর্থবছরের জুলাই১০ - মার্চ১১ সময়ে প্রতি ডলার ৭০.৩২ টাকা দাঁড়ায়।

সারণি ৬.৯ ঃ মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
গড় বিনিময় হার	৫৭.৪৩৪৭	৫৭.৯০০০	৫৮.৯৩৫৩	৬১.৩৯৩৯	৬৭.০৭৯৭	৬৯.০৩১৮	৬৮.৬০১৯	৬৮.৮০১২	৬৯.১৮৪৮	৭০.৩২১৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-মার্চ ২০১১

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ উলেণ্টখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ নভেম্বর ২০০৯ মাসে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরবর্তীতে স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে এবং ৩১ মার্চ, ২০১১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,৭৩১ মিলিয়ন ডলার। ৩০ জুন, ২০০১ থেকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ড় বছরওয়ারি এবং সর্বশেষ ৩১ মার্চ, ২০১১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.১০-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.১০ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
৩০.০৬.২০০৪	২৭০৫
৩০.০৬.২০০৫	২৯৩০
৩০.০৬.২০০৬	৩৪৮৪
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৬.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩১.০৩.২০১১	১০৭৩১

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬.২ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

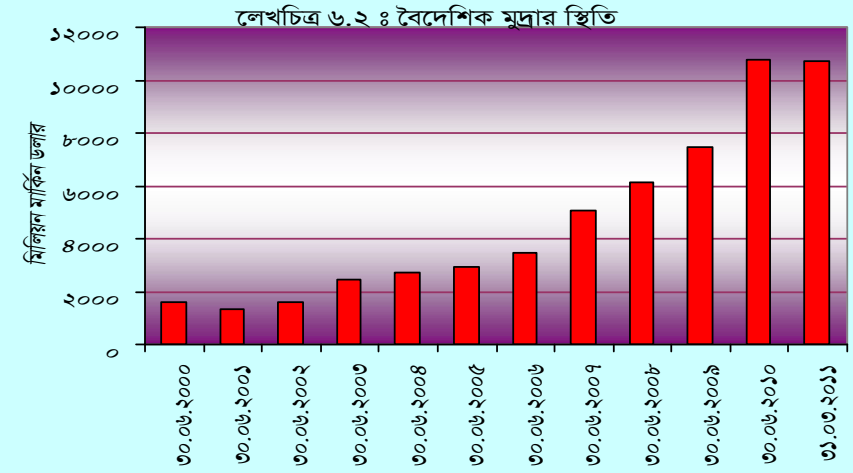

বাণিজ্য নীতি

বিশ্বব্যপী আর্থিক সংকট মোকাবেলায় সরকার ২০০৯-১২ মেয়াদে নতুন রপ্তানি ও আমদানি নীতি প্রণয়ন করে। যার ফলে মন্দার নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে থাকে এবং মন্দা পরবর্তী বিশ্ববাণিজ্যের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যেও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

বর্তমান রপ্তানি নীতির গুরুত্বপর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বায়নের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে রপ্তানি ব্যবস্থাকে (trade regime) যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা
- শ্রম (বিশেষ করে মহিলা শ্রম) নির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিতকরণ
- রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল সহজলভ্য করা
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমুখীকরণ
- পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন
- রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা
- রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করা
- নতুন নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারকদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা প্রদান করা।

রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে রপ্তানিতে, বিশ্বব্যাপী চলমান আর্থিক সংকটের প্রভাব পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় এবং সামগ্রিক ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ও ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এসকল প্যাকেজের আওতাধীন কোন কোন সুবিধার মেয়াদ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ও ২০০৯-১০ অর্থ বছরে শেষ হয়েছে এবং কোন কোন সুবিধা এখনও বিদ্যমান। এর আওতায় নগদ সহায়তা প্রদানসহ রপ্তানিকারকদের নানাবিধ সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

- দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল-(ইডিএফ)এর আকার ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার-এ উন্নীত করা হয়েছে।
- নতুন পণ্য (যেকোন বাজারে বিটিএমএ মিল উৎপাদিত প্রত্যক্ষ সুতা) রপ্তানি ও নতুন বাজার (আমেরিকা, কানাডা ও ইইউ ব্যতীত অন্য যে কোন বাজারে যেকোন পণ্য) প্রতিষ্ঠার জন্য রপ্তানি আয়ের (এফওবি) ওপর বর্ধিত ভর্তুকি হিসেবে প্রথম বছরে ৫ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বছরে ৪ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ২ শতাংশ হারে ৩ বছর পর্যন্ত বর্ধিত প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিটিএমএ-এর জন্য এ সুবিধাটি যে কোন বাজারে প্রত্যক্ষ সুতা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- বিভিন্ন ব্যাংকের প্রচলিত সার্ভিস চার্জ ও ফি-এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বড় ধরণের পার্থক্য নিরসনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল চার্জ ও ফিস এর হার যৌক্তিকীকরণের জন্য ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করেছে।
- রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে একক ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উন্নীত করে ৩ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুদের হার LIBOR +২.৫% এ নির্ধারণ করা হয়েছে।
- রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) উত্থাপিত জটিলতা নিরসনার্থে বস্ত্রখাতে পূর্ববর্তী অনধিক এক বছরের পরোক্ষ সুতা রপ্তানির মূল্যমান বা ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (যেটি কম হয়) মূল্যমানের সুতা/অন্য তন্তু এককালীন আমদানির জন্য বিটিএমএ সদস্য মিলগুলো LIBOR +২.৫% সুদ হারে স্ব স্ব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ঋণ উত্তোলন করতে পারবে।
- National Institute of Textile Training, Research And Design (NITTRAD) প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার ও বিটিএমএ-এর মধ্যে স্বীকৃত সহায়তা ব্যবস্থা অনুযায়ীঃ (১) ১ম বৎসর সরকার ১০০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে

(২) ২য় বৎসর সরকার ৬০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে (৩) পরবর্তী ৩ বৎসর সরকার ৫০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে এবং (৪) এর পর হতে বিটিএমএ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব বহন করবে।

- জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- Crust Leather শিল্পে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- হিমায়িত খাদ্য খাতে বর্তমানে চালু এবং রপ্তানি কাজে নিয়োজিত প্রকল্পসমূহে ব্যাংক প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণ সীমার ৩০ শতাংশ পৃথক করে এক বৎসরের Moratorium সহ পরবর্তী ৫ বৎসরে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধ্য মেয়াদি ঋণ হিসেবে স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি তৈরী পোশাক/বস্ত্র সামগ্রী (এসএমই) রপ্তানিকারকদের কতিপয় শর্তাধীনে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধার আওতায় ২০১০- ২০১১ অর্থ বছরের জন্য জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোগ (এফওবি মূল্যের ২৫ শতাংশ হারে)-এর ২ শতাংশ হারে বিশেষ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- পণ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে শুল্ক ব/ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা গৃহীত হলে ভর্তুকি সুবিধা না প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাটকলসমূহে উৎপাদিত পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি বিল নেগোশিয়েশন/কালেকশনের পাশাপাশি টিটি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত অগ্রিম মূল্যের বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- আইটি/সফটওয়্যার ফার্মের অনুকূলে কতিপয় ফিস পরিশোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়াই অনুমোদিত ডিলারগণ কর্তৃক রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা হিসাব হতে ১০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান আমদানি নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- ডব্লিউটিও এর আওতায় বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ধারায় যে পরিবর্তন সচিত হয়েছে তার আলোকে আমদানি নীতিকে আরো সহজ করা
- পণ্যের আমদানির উপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পের উপাদান অধিকতর সহজলভ্য করা এবং প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান
- রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমহকে সহজভিত্তিক আমদানির সুবিধা প্রদান করে দেশীয় রপ্তানিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো
- গুণগতমান ও স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা
- জনস্বার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে আপদকালীন পণ্য আমদানির সংস্থান।

গত কয়েক বছর যাবত সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত ট্যারিফ কাঠামোকে একটি সহজবোধ্য সাধারণ ট্যারিফ কাঠামোতে রূপান্তরের প্রচেষ্টার ফলে ট্যারিফ ধাপ বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে সমগ্র ট্যারিফ কাঠামো একটি সুসমন্বিত রূপ লাভ করেছে।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন.) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণিতে ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৬.১১ ঃ ২০০০-০১ অর্থ বছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থ বছর	'অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫,১৫,২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫,	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩,৫,১২,২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩,৫,১২,২৫	২৫	৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন. হারের ওপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন. ট্যারিফ হারের ওপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি; (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি; এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন- গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

(ক) রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ

(খ) নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ

(গ) ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল

(ঘ) টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল

(ঙ) কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ

(চ) কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি

(ছ) চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ

(জ) সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট

(ঝ) কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীট নাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল

(ঞ) হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১০-১১ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের ৫৭.২২ শতাংশ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১৪.৮৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫০ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের ওপরে মূল্যভিত্তিক শুল্ক আরোপ করা হয়। ২৪টি ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন, চিনি, সিমেন্ট, ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের ওপরে বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। নিম্নের সারণিতে এমএফএন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলো:

সারণি-৬.১২ঃ এমএফএন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থ বছর	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ(%)	১৮.৮৫	১৬.৫৩	১৬.৩৯	১৪.৮৭	১৭.২৬	১৫.১২	১৪.৯৭	১৪.৮৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহযোগিতা

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও)'র সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। চলমান দোহা রাউন্ড আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার, স্বল্প দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেবা খাতের ওয়েভার (waiver) সিদ্ধান্ত দ্রুত অনুমোদন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশের খাদ্য আমদানির সুযোগ অবারিত রাখা, বাজার প্রবেশাধিকারে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাসহ স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্য ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় জোরালো দাবী জানিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সক্রিয় উদ্যোগের প্রেক্ষিতে এ সকল দাবী এখন স্বল্পোন্নত দেশের মূল দাবীতে পরিণত হয়েছে, যা বিগত ১৫ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে তানজানিয়ার দারেস-সালামে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তা'ছাড়া, হংকং ঘোষণার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৯৭ শতাংশ শুল্ক-মুক্ত পণ্যের তালিকায় স্বল্পোন্নত দেশের প্রধান প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ যাতে Disproportionately Affected Countries (DAC) হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশের চাইতে কম সুবিধা পায় সে বিষয়ে দাবী জানানোর বিষয়েও স্বল্পোন্নত এবং সার্কভুক্ত দেশের মন্ত্রীগণ একমত হয়েছেন।

জেনেভায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের জোরালোর দাবীর প্রেক্ষিতে সদস্য দেশের মন্ত্রিগণ তাঁদের বক্তব্যে স্বল্পোন্নত দেশের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত বাজার সুবিধা প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের বিষয়ে সমর্থন জানান। ইতোমধ্যে ব্রাজিল ২০১০ সালের প্রথম থেকে স্বল্পোন্নত দেশের ৮০ শতাংশ পণ্যের জন্য শুল্ক-মুক্ত বাজার সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে এবং আগামী চার বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট ২০ শতাংশ পণ্যের জন্যও শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আলোচনার সাথে দেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এনহ্যান্সড্ ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক (ইআইএফ)-এ যোগদান করেছে । বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের মহা -পরিচালককে ইআইএফ ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইআইএফ-এর আওতায় বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) প্রণয়নের কাজ চলছে। DTIS এর মাধ্যমে দেশের ব্যবসা -বাণিজ্যে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক "এ্যাকশন ম্যাট্রিক্স " প্রণয়ন করা হবে। এ এ্যাকশন ম্যাট্রিক্স এর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে দেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এসব প্রকল্পে "এইড ফর ট্রেড" এর আওতায় বিভিন্ন দাতা দেশ/সংস্থা ফান্ড প্রদান করবে। উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইআইএফ এর "ডোনার ফ্যাসিলিটেটর "হিসেবে কাজ করছে।

তা'ছাড়া, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের যে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন তা নিরূপণ করে একটি প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ডবিণ্টউটিও টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় বিগত বছরগুলোতে ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, সার্ভিস ও নন-এগ্রিকালচার মার্কেট এক্সেস (নামা) উপর ঢাকায় ৬টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করাসহ ডবিণ্টউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়েও একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় এবং ২০১১ সালে এগ্রিকালচার, ডিসপিউট সেটেলমেন্ট ও ট্রেড নেগোসিয়েশন স্কিল/টেকনিক এই তিনটি বিষয়বস্তুর উপর ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য ডব্লিউটিও এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (আরটিএ) ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পাঁচটি আঞ্চলিক বাণিজ্য এলাকা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার মধ্যে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা (পিটিএ) এবং দ'ুটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (এফটিএ)। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক (bi-lateral) বাণিজ্য চুক্তিও রয়েছে। নিম্নে আঞ্চলিক বাণিজ্য এলাকা চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল ঃ

এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)

এসকাপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্ড়ঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণই এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এর সদস্য দেশসমূহ উলেণ্টখযোগ্যসংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। নভেম্বর ২০০৫ মাসে অনুষ্ঠিত আপটার প্রথম মিনিস্টেরিয়্যাল মিটিং এ চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তিরূপে স্বাক্ষরিত হয়। ২৬ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে ভারতের গোয়াতে দ্বিতীয় মিনিস্টেরিয়্যাল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ড়ক্রমে আপটা সদস্য দেশসমূহের ৪র্থ দফা নেগোসিয়েশন শুর" করা হয়। এ নেগোসিয়েশন শুল্ক সুবিধা গভীরতর ও বিস্ড়ৃততর করার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ও অন্র্ড়ভুক্ত করা হয়, যেমন: অশুল্ক বাধা, বাণিজ্য সহজীকরণ, সেবা খাত এবং বিনিয়োগ। ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় মিনিস্টেরিয়্যাল কাউন্সিলের সভায় Framework Agreement on Trade Facilitation এবং Framework Agreement on Investment স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া, ইতোমধ্যে সেবা খাতের উপর চুক্তিটি চূড়ান্ড় হয়েছে এবং তা সদস্য দেশ সমূহের স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। ২০১১ সনের শেষের দিকে বাংলাদেশে আপটা এর মিনিস্টেরিয়্যাল কাউন্সিলের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

Trade Preferential System among OIC Countries (TPS-OIC)

ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত TPS-OIC-এর আওতায় Trade Negotiating Committee (TNC) ইতোমধ্যে প্রথম দফা বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করেছে। প্রথম দফা আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ ''Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC'' (PRETAS) চূড়ান্ড় করেছে। এ পর্যন্ড় বাংলাদেশসহ ১১টি দেশ Protocol-এ স্বাক্ষর করেছে। Protocol অনুযায়ী শুল্ক হ্রাস বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

- চুক্তিভুক্ত প্রতিটি দেশ মোট ট্যারিফ লাইনের ৭ শতাংশ পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার আওতায় আনবে। তবে কোন দেশের মোট ট্যারিফ লাইনের ৯০ শতাংশ অথবা তদূর্ধ্ব পণ্যের বেস রেট যদি ০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ -এর মধ্যে থাকে তাহলে তারা মোট ট্যারিফ লাইনের ১ শতাংশ পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার আওতায় আসবে
- সদস্য দেশসমূহে নিম্নরূপ প্রক্রিয়ায় শুল্ক কমিয়ে আনা /হ্রাস করা হবে :

  * যে সব পণ্যের শুল্কহার ২৫ শতাংশ -এর উর্ধ্বে সেসব পণ্যের শুল্কহার ২৫ শতাংশে

  * যে সব পণ্যের শুল্কহার ১৫ শতাংশ -এর উর্ধ্ব থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ড় সে সব পণ্যের শুল্কহার ১৫ শতাংশে

  * যে সব পণ্যের শুল্কহার ১০ শতাংশ -এর উর্ধ্ব থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ড় সে সব পণ্যের শুল্কহার ১০ শতাংশে

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ছয় বছরের মধ্যে এবং অস্বল্পোন্নত দেশসমূহ চার বছরের মধ্যে এ শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে
- এখানে স্বেচ্ছায় ফাষ্ট ট্রাক প্রক্রিয়ায় শুল্ক কমানোর ব্যবস্থাও রয়েছে
- শুল্ক হ্রাসের আওতাভুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন নতুন শুল্ক আরোপ অথবা শুল্ক বৃদ্ধি করা যাবে না
- প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধাসমূহ দূরীকরণ/কমানোর ব্যবস্থা আছে
- PRETAS কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি প্রবর্তন করা হবে।

উলেণ্টখ্য, ১ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখ থেকে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুর" হওয়ার কথা থাকলেও আলোচনা সমাপ্ত না হওয়ার কারণে এযাবৎ তা কার্যকর হয়নি।

উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (ডি-৮)

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জোট গঠিত ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ (বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্ক) এর অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

- যে সব পণ্যের ট্যারিফ রেট ১০ শতাংশের উর্ধ্বে আছে সে সব পণ্যের (ট্যারিফ লাইনের) ৮ শতাংশ পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার আওতায় আসবে।
- সদস্যদেশসমূহ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় শুল্ক কমিয়ে আনা হবে:
  - * যে সব পণ্যের শুল্কহার ২৫ শতাংশ এর উর্ধ্বে সেসব পণ্যের শুল্কহার ২৫ শতাংশ
  - * যে সব পণ্যের শুল্কহার ১৫ শতাংশ -এর উর্ধ্ব থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত যে সব পণ্যের শুল্কহার ১৫ শতাংশ
  - * যে সব পণ্যের শুল্কহার ১০ শতাংশ -এর উর্ধ্ব থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সে সব পণ্যের শুল্কহার ১০ শতাংশে

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহ আটটি বার্ষিক কিস্তিতে এবং অস্বল্পোন্নত দেশসমূহ চারটি বার্ষিক কিস্তিতে শুল্কহার কর্মসূচি সম্পন্ন করবে
- যে সমস্ত পণ্য শুল্ক হ্রাস কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সে সবের ক্ষেত্রে সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন ব্যতীত শুল্কহার বৃদ্ধি করা যাবে না
- প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যরিয়ারর্স কমানো/দূরীকরণের বিধান ও এ চুক্তিতে রয়েছে।

মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (এফটিএ)

দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা)

সাফটাভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি অনুযায়ী জোটের উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা) ১ জানুয়ারি ২০০৯ এ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য স্ব স্ব দেশের সেনসিটিভ তালিকা- বহির্ভুত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্কহার ০ শতাংশ-৫ শতাংশে এ নামিয়ে আনবে। অন্যদিকে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ স্ব স্ব দেশের সেনসিটিভ তালিকা বর্হিভূত পণ্যসমূহের শুল্কহার ১ জুলাই ২০১৬ এ ০ শতাংশ - ৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে।

ইতোমধ্যে ভারত সেনসিটিভ তালিকা- বর্হিভূত সমস্ত পণ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। তাছাড়া, ভারত ৬ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে সেনসিটিভ তালিকায় পণ্য সংখ্যা ৭৪৪ থেকে ৪৮০- তে কমিয়ে এনেছে । তাছাড়া ভারত দ্বিপাক্ষিক MoU এর অধীনে বাংলাদেশকে ৮ মিলিয়ন পোষাক পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। বর্তমানে Tariff Rate Quota (TRQ) প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ভারতকে অনুরোধ করেছে। পাকিস্তান সেনসিটিভ তালিকা বর্হিভূত পণ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে প্রতিটি সদস্য দেশের সেনসিটিভ তালিকার অন্তর্ভুক্ত মোট পণ্য সংখ্যার ২০ শতাংশ হ্রাস করার বিষয়ে আলোচনা চলছে।

অধিকন্তু, সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাঁধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি এনটিএম (নন-ট্যারিফ মেজার্স) সাব-গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া, সার্ক অঞ্চলে বিভিন্ন পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড হারমোনাইজেশন করার উদ্দেশ্যে সাফটা চুক্তির আওতায় একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উলেণ্টখ্য, প্রাথমিক অবস্থায় এ চুক্তিতে শুধুমাত্র পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে সেবাখাত এবং বিনিয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেবা খাতের উপর চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে এবং তাতে সকল দেশ স্বাক্ষর করেছে। বিনিয়োগের উপর অলোচনা চলছে। উলেণ্টখ্য, ২০০৮ সালে আফগানিস্তানকে সাফটা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

বিমসটেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক ও নরমাল ট্র্যাক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক-এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভুটান ও নেপাল) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমুহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অপরদিকে, নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আট বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ১৯তম বিমসটেক Trade Negotiating Committee (টিএনসি) সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এইচএস ২০০৭ এর আলোকে Fast Track Elimination 10 na¡wn; Normal Track Elimination 48 na¡wn, Normal Track Reduction ১৯ na¡wn এবং Negative List ২৩ na¡wn ভিত্তিতে ট্যারিফ সিডিউল সংশোধন করে সকল সদস্য দেশের মধ্যে বিনিময় (exchange) করতে হবে। সভায় একমত পোষণ করা হয় যে, Agreement on Trade in Goods আলোচনা ২০১১ সালের মধ্যে শেষ করা হবে।

সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০

মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে সৃষ্ট প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশীয় উৎপাদনকারীদের রক্ষা করার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান (Trade Remedy) আইন ব্যবহার করা হয়। যদি বাংলাদেশে কোন আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ এত বেশী হয় যে, তা কোন দেশীয় শিল্পকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা সৃষ্টি করে, তবে বাংলাদেশ শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ক্ষমতাবলে প্রণীত সেইফগার্ড আইনের আওতায় সরকার উক্ত পণ্যের আমদানি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে উক্ত দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারবে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় সেইফগার্ড শুল্ক বিধিমালা, ২০১০ শিরোনামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ অনুযায়ী পণ্যের সেইফগার্ড সম্পর্কিত কোন আবেদনের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের সেইফগার্ড কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।